আজ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩তম প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যানের জন্ম মিসৌরী প্রদেশের লামারে ১৮৮৪ সালে। ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের পর তিনি ক্ষমতায় আসেন। শাসনকাল ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৩ সাল। ক্যাপ্টেন হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়ে ফ্রান্সে যান ট্রুম্যান। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সেনেটর হিসেবে মিসৌরী থেকে মার্কিন কংগ্রেসে প্রবেশ ১৯৩৪ সালে। জন অ্যান্ডারসন ট্রুম্যানের তিনি বড় ছেলে। ইন্ডিপেন্ডেন্স হাইস্কুলে পড়াশোনা শেষ করে কমার্সিয়াল কলেজে ভর্তি হলেও পাঠ শেষ করেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আর্থিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সফল ট্রুম্যান। কোরীয় যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছিলেন।

শুক্রবার, ২৫ বৈশাখ ১৪২৭ ■ ৪০ বর্ষ ■ ৩৪৮ সংখ্যা

মৃত্যুর অডিট

হাসপাতালে লাশ নিয়েও সংঘাত। মৃত্যুর কারণ এখন বিবাদের অন্যতম বিষয়। করোনা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়ার পর যদি কেউ মারা যায়, তাহলেও অনেক ক্ষেত্রে ডেথ সার্টিফিকেটে তাঁর মৃত্যুর কারণ করোনা সংক্রমণ বলা হচ্ছে না। খুব চর্চা চলছে 'কো-মরবিডিটি' নিয়ে। এই ইংরেজি শব্দটির অর্থ, আরও অন্য কোনও রোগ বা সমস্যা থাকে সংক্রামিত ব্যক্তির। মৃত্যুর কারণ সেই অন্য রোগ বা সমস্যা হতে পারে। এই শব্দজালে করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর পরিসংখ্যান নিয়ে বিস্তর জলঘোলা চলছে। এর ফলে যতজন মারা যাচ্ছেন, তাঁদের সকলের মৃত্যুর কারণ করোনা সংক্রমণ বলা হচ্ছে না। দেশে এই চর্চাটা প্রথম শুরু হয় আমাদের রাজ্যেই। এজন্য বিরোধীরা তো বটেই, সাধারণ মানুষও প্রতিবাদ করছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ ইত্যাদিও চলছে। তৈরি হয়েছে নানা মিম, আঁকা হচ্ছে কার্টুন। সংবাদপত্রে প্রচুর জায়গা ব্যয় হচ্ছে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশের জন্য। এতে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। কিন্তু হঠাৎ অভিযোগের পরিসরটা বেড়ে গেল এখন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকও সেই একইভাবে পরিসংখ্যান দিতে শুরু করায়। শতাংশের বিচারে সেই পরিসংখ্যান বরং পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দু'দিন আগে দেশে যতজন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে, তার ৭০ শতাংশের মৃত্যুর কারণ কো-মরবিডিটি। মানে করোনা সংক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়নি। অন্য এমন কিছু রোগ বা সমস্যা তাঁর ছিল, যা শেষপর্যন্ত সেই করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কারও মৃত্যুর পরেও শান্তি নেই তাঁর স্বজনের। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দিশেহারা অবস্থা তাঁদের। ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ করোনা সংক্রমণ না লেখা হলেও দেহ দেওয়া হচ্ছে না মৃতের পরিবারকে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেহ সৎকার চলছে। উত্তরবঙ্গে আলিপুরদুয়ারে এরকম একজনের দেহ কবর দেওয়াকে কেন্দ্র করে পুলিশ মার খেয়েছে জনতার হাতে। এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের অনেক জায়গায় হয়েছে। বিরোধীরা এবং নাগরিকদের একাংশ এই কো-মরবিডিটি তত্ত্বকে করোনায় মৃতের আসল পরিসংখ্যান গোপন করার হাতিয়ার বলে হইচই করছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এরাজ্যে দু'দিন আগে পর্যন্ত করোনায় স্বীকৃত মৃত্যু আর কো-মরবিডিটির কারণে মৃত্যু সমান। আর দেশের ক্ষেত্রে করোনায় মৃত্যু মাত্র ৩০ শতাংশ। ৭০ শতাংশই কো-মরবিডিটির জন্য।

ফলে এতদিন যারা কোণঠেসা হয়ে সাফাই গাইছিল, তারা পড়ে গিয়েছে আতান্তরে। গুজরাটেও কো-মরবিডিটি উল্লেখ করছে সেখানকার সরকার। গুজরাট ও কেন্দ্রে একই দলের সরকার। ফলে সেই দলের এখন ব্যাখ্যা খুঁজতে হচ্ছে। এসবই রাজনীতির প্রসঙ্গ। আসল কথা হল, কো-মরবিডিটি উল্লেখ করার আদৌ কি কোনও যৌক্তিকতা আছে? এই কো-মরবিডিটি খোঁজার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ঘটা করে ডেথ অডিট কমিটি তৈরি হয়েছিল। এই কমিটি গঠন একেবারে বেনজির এবং এর মাধ্যমে যে চিকিৎসকরা ডেথ সার্টিফিকেট লিখছেন, তাঁদের জ্ঞান নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সাধারণ নিয়মে চিকিৎসকরাই ডেথ সার্টিফিকেট লেখার অধিকারী। অনেক ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটে কারণ সঠিকভাবে লেখার জন্য ময়নাতদন্ত করা হয় মৃতের দেহের।

তারপর আর কোনও অডিট কমিটির এক্তিয়ার নেই সেই ডেথ সার্টিফিকেট খতিয়ে দেখার। পশ্চিমবঙ্গে সেই অনৈতিক কাজটাই হয়েছে। আবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকও যেহেতু কো-মরবিডিটির তত্ত্ব আমদানি করেছে, ফলে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক, সেই কো-মরবিডিটি খতিয়ে দেখল কে? সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ডেথ সার্টিফিকেটেই তার উল্লেখ আছে না কেন্দ্রীয় সরকারও কোনও অডিট কমিটি গড়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও নেই বলে ধোঁয়াশা থাকাই স্বাভাবিক। মৃত্যুর অডিট বিষয়টি আদৌ সঠিক কি না, এর আইনি বৈধতা কতটা ইত্যাদি প্রশ্নগুলিও তাই প্রাসঙ্গিক। এই মহামারির বিপন্ন সময়ে যখন তথ্যের স্বচ্ছতার ওপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণে, তখন সরকারের (রাজ্য বা কেন্দ্র, যে-ই হোক না কেন) দায়িত্ব থাকে বিষয়টির বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া।

দুর্ভাগ্যজনক হল, কোনও সরকারের পক্ষে সেই তাগিদ দেখা যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষ বোঝেন, করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর কারও মৃত্যু হলে তাঁর অন্য যে রোগই থাকুক না কেন, মূল কারণ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণই। অন্য রোগ বা সমস্যা আছে বলে তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু করোনায় আক্রান্ত না হলে এখনই তাঁর জীবন হয়তো শেষ হয়ে যেত না। ফলে সাধারণ মানুষের চোখে কো-মরবিডিটি তত্ত্বের অর্থ আসলে মৃত্যুর সংখ্যা কম দেখানোই। বিশ্বাসযোগ্য পালটা যুক্তি দিলেই একমাত্র এই ধারণার বদল সম্ভব। সরকার দেবে কি?

অমৃতধারা

ব্রহ্ম বিকাশে অন্ধকার আপনা হতে দূর হয়ে যায়, যেমন বহুদিনের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালা মাত্র সমস্ত অন্ধকার দূরে চলে যায়। সাধক তখন আত্মহারা হয়ে সমস্ত বস্তুই আলোতে উদ্ভাসিত দেখে আর অবাক হয়ে যায়। তখন আর তার রিপু বা প্রবৃত্তি জোর করে দমন করতে হয় না — ওসব আপনা হতেই দমন হয়ে যায়।

লোকে বলে অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু তা আদৌ হয় না। বিশ্বাস কখনও অন্ধ নয়। সর্বদাহ চক্ষুষ্মান। যার বিশ্বাস এসেছে, তারও যে হঠাৎ এসেছে তা নয়। কত জন্ম জন্মান্তর, কত বিচার,কত তর্ক করে তারপর তার বিশ্বাস এসেছে। তাই দেখা যায়, একটি বালকের হয়তো অগাধ ভক্তিবিশ্বাস, আর একটি বৃদ্ধের একবারে তার বিপরীত। আবার বিচার করে দেখ, বিশ্বাস করতে লোকে ঋষিবাক্য বা গুরুবাক্যেই বিশ্বাস করে থাকে। সুতরাং বিশ্বাস কখনও অন্ধ হতে পারে না। যার বিশ্বাস এসেছে, তার তো কোনো চিন্তাই নাই। যার বিশ্বাস আসেনি, বিশ্বাস আনার জন্যই তাকে সাধ্যসাধনা করতে হয়। বিশ্বাসের মতো বড়ো জিনিস আর কিছু নাই। নিম্নস্তরেই যত ভেদ। যতই উঁচুতে উঠবে, ততই ভেদবুদ্ধি দূর হয়ে যাবে– সব অখণ্ড বলে জ্ঞান হবে।

–স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

শব্দরঙ্গ ■ ২৬০৩

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। বাংলা বছরের একটি মাস ৩। তাঁতের মাকু, রণশিঙা ৫। তিন ফোঁটাযুক্ত তাস ৬। ধনী ৮। উগ্র গন্ধযুক্ত কন্দবিশেষ যা মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয় ১০। ছোট বকবিশেষ, কোঁচবক ১২। মুসলমানদের ধর্মনেতা বা গুরু ১৪। পৃথিবী, জল, বাক্য বা বাণী, খাদ্য বা অন্ন ১৫। বাংলার একটি ঋতু ১৬। প্রাসাদ।

উপর-নীচ : ১। আগুন, আগুনের অধিদেবতা ২। বিষয়ানুক্রমিক হিসাবের বই, জমিজমার খাজনাদি আদায় উশুলের হিসাববই ৪। অশ্বারোহী সৈন্যদল ৭। বিনাশ, ধ্বংস, বৃহত্তর কোনও কিছুতে বিলীন হওয়া ৯। প্রশ্রয়, আশকারা ১০। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজের নাম ১১। চাতকপাখি, মুনিবিশেষ ১৩। শ্রীকৃষ্ণ, বসন্তকাল।

সমাধান ■ ২৬০২

পাশাপাশি : ১। আরশি ৩। নামজাদা ৪। উলেমা ৫। ধাতুমল ৭। খত ১০। কশা ১২। নীলগিরি ১৪। গরিমা ১৫। হরিহর ১৬। নন্দন।

উপর-নীচ : ১। আত্মসুখ ২। শিউলি ৩। নামধাম ৬। মড়ক ৮। তন্ডুল ৯। কারিগর ১১। শামাদান ১৩। কামান।

সত্যনিষ্ঠা আর বিজ্ঞানচেতনায় ঋদ্ধ রবীন্দ্ররচনা

স্বীকার না করে উপায় নেই যে, কবির সমগ্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যে যে সাধারণ সূত্রটি দৃপ্ত হয়ে আছে তা হল– সত্যনিষ্ঠা, যুক্তিবাদ, তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের সমন্বয় এবং মানুষ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার অঙ্গীকার। অন্যভাবে বলতে হয়, বিজ্ঞানবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রচেতনার অপর নাম এবং তাঁর অসামান্য সাহিত্যকৃতির পরিচিতি। লিখেছেন ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়।

মানবসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, শিক্ষা, সমাজচিন্তা, চিত্রকলা, দর্শন এবং অসংখ্য চিঠিপত্র ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে তাঁর যে অক্ষয় কীর্তি, সেটা তাঁর বিপুল প্রতিভা, প্রাণশক্তি ও কর্মক্ষমতার জোরেই। রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সকল সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল পৃথিবীর দরিদ্রতম ও পরাধীন একটি দেশে, এ কথা ভাবলে তাঁর সৃজনের মহত্ত্ব যেন বহুগুণে ভাস্বর হয়ে ওঠে। ভারতের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জাতিবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, অন্ধ সামাজিকতা, কুসংস্কার, দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা যে তাঁর কাজে বহু বিঘ্ন ঘটিয়েছে, তাতে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু মৃত্যুর প্রায় আট দশক পরেও রবীন্দ্রনাথ এত সমকালীন, প্রাসঙ্গিক এবং চিরায়ত। স্বীকার না করে উপায় নেই যে, কবির সমগ্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যে যে সাধারণ সূত্রটি দৃপ্ত হয়ে আছে তা হল– সত্যনিষ্ঠা, যুক্তিবাদ, তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের সমন্বয় এবং মানুষ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার দৃঢ় অঙ্গীকার। অন্যভাবে বলতে হয়, বিজ্ঞানবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রচেতনার অপর নাম এবং তাঁর অসামান্য সাহিত্যকৃতির পরিচিতি।

আধুনিক বিজ্ঞান থেকে রবীন্দ্রনাথের কোনও সুবিধা পাওয়ার কথাই ওঠে না। বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তৃত পরিসরেই ছিল তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য। বরং বিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশটা অনধিকারচর্চা কিংবা রোমান্টিকতা বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনকাল অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, বাল্যকাল থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা ছিল। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'নানা বিদ্যার আয়োজন' নিবন্ধে তিনি এর কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। মাত্র সাড়ে বারো বছর বয়সে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' শিরোনামে। সেটাই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা। সেটা ছিল একটি ধারাবাহিক রচনার প্রথম কিস্তি। কিন্তু যেকোনও কারণেই হোক, পরের অংশগুলি আর লেখা হয়নি বা প্রকাশিত হয়নি। উত্তরজীবনে তিনি অন্তত দু'বার ওই রচনার উল্লেখ করেছেন। 'জীবনস্মৃতি'র হিমালয় যাত্রা অধ্যায়ে লিখেছেন, 'তিনি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতেন। আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।' ওই সময়ে পিতার স্নেহের পরশে সিক্ত মন শিখেছিল নিবিড়, নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে কাছে নেমে আসা তারা, নক্ষত্র ও গ্রহদের বিন্যাস, সৌরজগৎ ও ছায়াপথ।

জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ তাঁর চেতনাকে তখনই আলোড়িত করেছিল। এর অনেক বছর পরে ১৯৩৭ সালে জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ ৭৭ পৃষ্ঠার এক চটি বই লিখলেন 'বিশ্বপরিচয়' নামে। বইটি উৎসর্গ করলেন আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। লোকশিক্ষা প্রকল্পের এই বইটি সাহিত্য, নান্দনিকতা এবং ভাষা ও রচনাশৈলীর দিক থেকেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনবিজ্ঞানের গ্রন্থ। যদিও এই বইয়ে সহজ, সরল প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা আছে পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, ভূলোককে এবং একটি অনবদ্য 'উপসংহার' আছে। সেই সময় বিজ্ঞানের এই আলোচ্য শাখার সকল আবিষ্কার এই চটি বইতে অসাধারণ ভাষা ও শৈলীতে লিপিবদ্ধ আছে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে, বাংলা ১৩৪৪-এর আশ্বিন মাসে। পৌষমাসে দ্বিতীয় সংস্করণ এবং পরের দু'বছরের মধ্যে আরও ৩টি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন ৭৬ বৎসর। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সমস্ত পর্বেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার, উদ্ভাবনা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। যদিও তখন বিজ্ঞানের বই সংগ্রহ করা খুব কঠিন ছিল। যুগটিও ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে চমকপ্রদ।

১৮৫৯ সালে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব, লুই পাস্তুরের জীবজগৎ ও প্রাণের তত্ত্ব ১৮৬১ সালে, মেন্ডেলের জীবের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব ১৮৬৩, হার্টজ আবিষ্কার করছেন ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ১৮৮৭ সালে, ওই সালেই আলোর গতিবেগ আবিষ্কার করলেন মাইকেলসন মারলে, ১৮৯৬ সালে তেজস্ক্রিয়তা, ১৮৯৭ সালে টমসনের ইলেক্ট্রনের অস্তিত্ব আবিষ্কার, ১৮৯৫-এ রন্টজেন বলছেন এক্স-রে'র কথা, ১৯০০ সালে প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ও মহাকর্ষসূত্র উদ্ভাবন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের যৌবনেই বিজ্ঞানের বহু যুগান্তকারী আবিষ্কার সভ্যতাকে উৎকর্ষের পথে নিয়ে গিয়েছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ এসব উদ্ভাবনা জানার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। 'বিশ্বপরিচয়' তো বটেই, বিজ্ঞানচেতনার বহু চিহ্ন তাঁর নানা কবিতা, গল্প ও রচনায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। 'বিশ্বপরিচয়'-এর উৎসর্গপত্রে তিনি তার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়েছেন। বিজ্ঞান বিষয়ে নিজের পড়াশোনার এরকম স্পষ্ট উদাহরণ তিনি আর কোথাও দেননি। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তাঁর ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ থেকে এর কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়।

স্যার রবার্ট বল-এর 'দ্য স্টোরি অফ দ্য হেভনস' (১৮৯১), হেরমান ফন হেলম হোলৎস-এর 'শব্দশ্রুতির শারীরবৃত্ত' এবং পপুলার লেকচার্স অন সায়েন্টিফিক সাবজেক্টস (১৮৯৩), জুলিয়াস জাখস-এর টেক্সট বুক অফ বটানি, জগদীশচন্দ্র বসুর তিনটি গবেষণাগ্রন্থ উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত বিষয়ক, হার্বার্ট স্পেনসারের দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'এসেস, সায়েন্টিফিক, পলিটিক্যাল অ্যান্ড স্পেকিউলেটিভ' (১৮৮৩) এবং একই লেখকের আরও তিনটি বই। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কবি বলছেন, 'ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে' (বিশ্বপরিচয়)। উনিশ শতকের নবজাগরণ বা উন্মেষপর্বে অবিভক্ত বাংলায় বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের চেষ্টার ফলে বিজ্ঞানের সংস্কৃতি ক্রমশ সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়ে উঠেছিল। এটাকে আমরা বিজ্ঞানের মতাদর্শ বা আইডিওলজি বলতে পারি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মধ্যযুগের অনড় বিশ্বদৃষ্টি ও অন্ধ সামাজিক রীতিনীতি থেকে পুরোদস্তুর আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর্ব সবচেয়ে পরিণতি পেল রবীন্দ্রনাথের সৃজনে। বিজ্ঞান তাঁর বিশ্বদৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে নির্মোহ সত্যের জন্য উঠল। বিজ্ঞানের অন্বেষণ, নিষ্ঠা, নিরন্তর আকুতি ও বিনীত স্বচ্ছতা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনা, মননশীলতা, সংবেদনশীলতা এবং ব্যক্তিত্বকে চালিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। স্থানকাল নির্বিশেষে যিনি যুগের প্রবণতাগুলি আগাম ধরতে পারেন। কবি তাই বিজ্ঞান সাধনার উল্লেখ করে বলেছেন, 'প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্ব ব্যাপারের মূল রহস্য কেবলই অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে, তার সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই। অথচ যারা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে বঞ্চিত হল, তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্ত দেশে একঘরে হয়ে রইল।' অনেক বছর পর ১৯৮৩ সালে প্রায় একই কথা বলেছেন মহাকাশ-পদার্থবিদ কার্ল সেগান ('কসমস')। কবি লিখেছেন, 'বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।' এই দৃষ্টিই তাঁকে জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রীতি, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সখ্য ও আত্মীয়তার রসায়নে ঋদ্ধ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, রচনা, কবিতা, সংগীত, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি সবকিছুতেই বিজ্ঞানের সংস্কৃতিকে তিনি সাহিত্যের মৌলিক ভাবগত ও নান্দনিক ভারসাম্যে গেঁথেছিলেন। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে কবি মিলিত হয়েছিলেন চারবার। প্রথম ১৯২৬-এর ২৫ সেপ্টেম্বর, পরে ১৯৩০-এর ১৪ জুলাই এবং ১৯ অগাস্টের মধ্যে তিনবার। সাক্ষাৎগুলি হয়েছিল জার্মানিতে (বার্লিন) ও একবার নিউ ইয়র্কে। রমা রঁলার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়। কবি ও বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা ছিল বিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিস্টেমোলজি সংক্রান্ত। এই আলোচনায় শুধু আপেক্ষিকতা সূত্র নয়, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, অনিশ্চয়তা সূত্র (হাইজেনবার্গ), নীল কেহরের পরমাণুর গঠনতত্ত্ব ইত্যাদি সাম্প্রতিক আবিষ্কারের দার্শনিক প্রতিঘাত, প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে একটি সমবায়মূলক বিশ্ববীক্ষা বিষয়ে বিস্তৃত মতবিনিময় ঘটেছিল। এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানবদ্ধ সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। বিজ্ঞানের সত্যকে কবি সাহিত্যের মাধুরী মিশিয়ে হাজির করেছেন আমাদের চেতনাকে সত্যের রঙে রাঙিয়ে দিতে। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি জীবনীকাররা বলেছেন, খুব কম শিল্পীই মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে উচ্চতম মানের কাজ করতে পারেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রম।

তবে তাঁরা আরও বলতে পারতেন, ওই সময়েই বিজ্ঞান যেন খুব সহজভাবে তাঁর সৃজনে অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছিল। 'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃজন (১৯২৩)। এই নাটক সম্পর্কে এখানে আলোচনার সুযোগ নেই। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, নাটকটির প্রতিনায়ক ছিল ভারী শিল্প এবং তার আনুষঙ্গিক জীবনধারা অর্থাৎ প্রকারান্তরে টেকনোলজি। যক্ষপুরীর সমস্যাটা গোটা পৃথিবীর প্রেক্ষিতে এক জীবন্ত সমস্যা। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে কবি ধর্মের কথা বলতে বলতে ক্রমাগত বিজ্ঞান থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করছেন। কারণ, তাঁর মনে ছিল বিজ্ঞানের প্রশস্ত জমি। জীবনের শেষ দশ বছরে বিজ্ঞান বিশেষভাবে তাঁর সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়েছিল। 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্পেই বিজ্ঞানের উপস্থিতি। 'শেষ কথা' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় প্রকৃতি, বস্তুগত, জীবজগৎ এবং মানুষের অন্তর্লীন সম্পর্কের কথা। 'রূপনারায়ণের কূলে নেমে শুধিলাম, জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।'

–লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার

সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মধ্যযুগের অনড় বিশ্বদৃষ্টি ও অন্ধ সামাজিক রীতিনীতি থেকে পুরোদস্তুর আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর্ব সবচেয়ে পরিণতি পেল রবীন্দ্রনাথের সৃজনে। বিজ্ঞান তাঁর বিশ্বদৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে নির্মোহ সত্যের জন্য উঠল। বিজ্ঞানের অন্বেষণ, নিষ্ঠা, নিরন্তর আকুতি ও বিনীত স্বচ্ছতা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনা, মননশীলতা, সংবেদনশীলতা এবং ব্যক্তিত্বকে চালিত করেছে।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বিশ্বকবি ও লকডাউন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী ও তাঁর প্রতিটি লেখা আমাদের সবসময় আকৃষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু হঠাৎ করে পৃথিবীর বুকে যে ঝড় নেমে এসেছে তাতে এই মহান মানুষের জন্মদিনে আমাদের ঘরে বন্দি থাকতে হবে। অবশ্যই আমরা লকডাউন মেনে চলব। কিন্তু ঘরে ঘরে অন্যান্য পুজোর মতো রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমাদের বাড়িতে তারই পরিকল্পনা চলছে। আশা করি, সব ছাত্রছাত্রী এবার ঘরে বসেই বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধা জানাবে। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই আমাদের সুখ-দুঃখের আশ্রয়স্থল।

লকডাউনে আমরা যখন ঘরবন্দি অবস্থায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু'– গানটি আমাদের নতুন উদ্যমে ভালো থাকার শক্তি জোগায়। কাজেই এবার শারীরিক দূরত্ব ও সরকারি বিধি মেনে রবীন্দ্রচর্চা করা হোক।

উপলব্ধি রাজগুরু, ষষ্ঠ শ্রেণি, সেন্ট ইগনেসিয়াস হাইস্কুল
কানকি, উত্তর দিনাজপুর।

বিপদে বন্ধু চেনার সময় এসেছে

বর্তমানে আমরা এক সংকটজনক অবস্থায় রয়েছি। আমাদের রাজ্যও খুব সুবিধাজনক অবস্থায় আছে বলে মনে হয় না। নানা বিষয়ে সমালোচনা থাকলেও, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অবস্থার উন্নতিতে যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও সরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুদিন আগেও আমরা এমনই কিছু প্রতিষ্ঠানের সমালোচনায় মুখর ছিলাম। সুযোগ বুঝে বেসরকারিকরণের রব তুলতাম। কিন্তু এই দুর্যোগের মুহূর্তে ওই সব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ভূমিকা চোখে পড়ার মতো। তাই দেখলাম বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া। লকডাউন পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিনামূল্যে ইন্টারনেট, ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দিতে ধুঁকতে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিএসএনএল এগিয়ে এল। ভারতীয় রেলকে কিছুদিন আগেও বেসরকারিকরণের একটা গুঞ্জন উঠেছিল। তাতে সমর্থন করতে এগিয়ে এল একঝাঁক মুখ, যেন বেসরকারি করলেই কাল থেকে ট্রেন সঠিক সময় মেনে যাতায়াত করবে, বেহাল পরিকাঠামো কোনও বালাই না! কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় রেল নিজের আর্থিক লাভের অঙ্ক বিসর্জন দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ অটুট রেখেছে। রেল কোচগুলি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আইসোলেশন ওয়ার্ডে পরিণত হয়েছে। রেলের বিভিন্ন কারখানা মাস্ক, স্যানিটাইজার ইত্যাদি তৈরিতে ব্যস্ত। ভারতীয় রেল অনেক জায়গায় রান্না করা খাবার বিলি করছে। একই বিষয় দেখা গেল বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্ষেত্রে। বঙ্গভঙ্গের সময় গড়ে ওঠা শতাব্দীপ্রাচীন এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে স্বল্পমূল্যে জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সদিচ্ছার অভাবে সংস্থাটি রুগ্ন হতে থাকে। কিন্তু আজ আবার খবরের শিরোনামে বেঙ্গল কেমিক্যাল, কেননা এই সংস্থাটি দৈনিক ৮ লক্ষ হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন বানানোর ক্ষমতা রাখে। অথচ কিছুদিন আগে আমরাই বলতাম যেহেতু সংস্থাটি অলাভজনক, তাই বেচে দিলে হয় না!

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমাদের অভিযোগ কম নয়। 'ব্যাটাদের ব্যবহার মোটেও ভালো নয়', 'পরিষেবা তথৈবচ'– এই গোছের অভিযোগ প্রায়ই শুনতাম বা করতাম। তাই নাজেহাল হয়ে ভাবতাম ব্যাংক পরিষেবাকে বেসরকারিকরণ করলেই হয়তো সব সমস্যার সমাধান হবে। প্রশ্ন হল, যখন ইয়েস ব্যাংক ডুবল তখন সাধারণ নাগরিকের সঞ্চয় বাঁচাতে এগিয়ে আসল কে? এসবিআই। লকডাউনের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক দেশের নানা অঞ্চলে ন্যূনতম ব্যাংক পরিষেবা দিয়ে আসছে, যেখানে কিছু বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে অনেকেই ক্ষুব্ধ।

কিছুদিন আগেও মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা সরকারি হাসপাতাল নিয়ে উদাসীন ছিল। চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালই তাদের গন্তব্য ছিল। কিন্তু এই মহামারিতে কোয়ারান্টিন, পরীক্ষা, চিকিৎসা করতে সবার আগে এগিয়ে এল সরকারি হাসপাতাল। উলটো দিকে দেখলাম, কিছু নার্সিংহোম নিজেদের কোভিড হাসপাতালে রূপান্তর হতে বাধা দিল।

লকডাউনের মধ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রের সংগঠিত ও অসংগঠিত কর্মীদের ভাতা, র‍্যাশন, পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন, সরকারি কর্মী ও শিক্ষকেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে পুলিশকর্মী ও নার্সদের কথা না বললেই নয়, যাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে বেশি অভিযোগ ছিল এখন আমরা সেই সব পুলিশ, ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল স্টাফ, সাফাইকর্মীকে মাথায় তুলে নাচছি। তাঁদের নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিতে হুড়োহুড়ি। তবে এখন এদের কেউ আমাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকলেই রে রে করে উঠি!

তাই সময় এসেছে বিপদে বন্ধু চেনার। যাঁরা আপনাকে বলবে সরকারের কাজ ব্যবসা করা নয়, সরকারি সংস্থাগুলো বেচে দিলেই সমস্যার সুরাহা হবে, তারা দেশের প্রকৃত বন্ধু বা দেশপ্রেমিক নয়। বিভিন্ন সরকারি সংস্থার পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে দেশের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। পারস্পারিক কাদা ছোড়াছুড়ি, অপরকে হেয় করার মাধ্যমে প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় না। আসুন, এই কঠিন পরিস্থিতিতে সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে, সরকারি নিয়ম মেনে, নাগরিক কর্তব্য পালনের মাধ্যমে প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয় দিই।

মিজানুর রহমান, আঙ্গুলদেখা, হলদিবাড়ি।

জরুরি পরিষেবার কর্মীদের ওপর আক্রমণ কাম্য নয়

পুলিশ, স্বাস্থ্যকর্মী, সাংবাদিক– এই তিন পেশায় নিযুক্ত কর্মীদের উপর বিভিন্ন সময় আক্রমণের ঘটনা ঘটেই চলেছে, যা সুস্থ সমাজে কাম্য নয়। অথচ এই তিন পেশায় নিযুক্ত কর্মীদের জন্যই সাধারণ মানুষ সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন। মানছি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যবহার সহ্য হয় না, তাই বলে তাঁদের শারীরিকভাবে আক্রমণ কোনও মতেই কাম্য নয়। তার জন্য আইন রয়েছে, আইনের দ্বারস্থ হওয়া উচিত। আবার ধরা যাক, কোনও সাংবাদিকের সংবাদ পরিবেশন বিশেষ করে কোনও রাজনৈতিক দলের পছন্দ নাও হতে পারে, তাই বলে কি সাংবাদিককে আক্রমণ করতে হবে? সাংবাদিকরা আছে বলেই তো আমরা দেশ-বিদেশের খবর পাই।

এবার আসি পুলিশ প্রশাসনের উপর আক্রমণের ঘটনায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুলিশ যেভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছে তা প্রশংসনীয়। কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ বেশি সক্রিয়, আবার কিছু ক্ষেত্রে নমনীয়– এই বিষয়ে তাদের আরও একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। যেমন, বাদুড়িয়ায় ত্রাণ নিতে আসা একজন মহিলাকে দুজন লাঠিধারী পুলিশ অমানবিকভাবে লাঠিচার্জ করছে– এটা যেমন পুলিশের কাছে কাম্য নয়, তেমনই টিকিয়াপাড়ায় পুলিশ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আক্রান্ত হবেন সেটাও সহ্য করা যায় না। তবে আমার ধারণা, এই তিন পেশায় নিযুক্ত কর্মীদের আরও সংবেদনশীল ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করতে হবে।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

বেহাল চিকিৎসা পরিষেবা

উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর শহর রায়গঞ্জে একটি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল রয়েছে। তবে জটিল কোনও চিকিৎসা পরিষেবা এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন মাধ্যমে জানা যাচ্ছে, ছোট অপারেশনের ক্ষেত্রেও রোগীকে শিলিগুড়ি বা কলকাতায় রেফার করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের মোকাবিলার ন্যূনতম ব্যবস্থাও এখানে নেই। অন্যদিকে, মানুষের রোগব্যাধি থেকে শুরু করে দুর্ঘটনা যে এই জেলায় ঘটছে না তেমন নয়। এত ঘটা করে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ বানিয়ে যদি ভালো পরিষেবার ব্যবস্থা না করা হয় তবে এই প্রত্যন্ত জেলাকে বারবার অন্য শহরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এই জেলা এমনিতেই সবদিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। জেলার বিপুল পরিমাণ মানুষ শ্রমিকের কাজ করতে ভিনরাজ্যে চলে যান। অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। জেলায় ফিরে এসে কম পয়সায় চিকিৎসা পাওয়ার জন্য সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালেও তাঁদের ভর্তি হতে দেখা যায়। কম রোজগার করা এই সব শ্রমিকের কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসার করানোর মতো অর্থও থাকে না। তাঁদের বারবার সমস্যায় পড়তে হয়। উত্তর দিনাজপুর জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে আরও নজর দিক জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকার।

বিনয় লাহা, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

বিলুপ্তির পথে ইটালিয়ান সেলুন

তখন এমন সুসজ্জিত ও আরামদায়ক সেলুন ছিল না। ক্ষৌরকর্ম করাতে গেলে দুটো ইট পেতে খোলা আকাশের নীচে বসতে দেওয়া হত। তারপর খদ্দেরের ক্ষৌরকর্ম করা হত। ইটের ওপরে বসতে দেওয়া হত বলে অনেকেই রসিকতা করে একে ইটালিয়ান সেলুন বলতেন।

কিন্তু সত্তরের দশকের পর থেকেই সেলুনে আধুনিকতার ছোঁয়া দেখা গেল। কিছু মানুষ নির্দিষ্ট ঘরে তাঁদের ব্যবসা শুরু করলেন। ঘরগুলি ধীরে ধীরে সুসজ্জিত হতে থাকল। বিভিন্ন সুগন্ধি ব্যবহৃত হতে লাগল। অল্পবয়সি ছেলেরা তাদের আড্ডা দেওয়ার একটা ভালো জায়গা খুঁজে পেল। আর ক্রমশই ব্যাকফুটে যেতে শুরু করল ইটালিয়ান সেলুনের দাদু-কাকুরা। সুদৃশ্য আলোর সেলুনের পেছনের অন্ধকারে শম্বুকগতিতে কিছু বয়স্ক মানুষ এখনও তাঁদের ইটালিয়ান সেলুন চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে সে সংখ্যা খুবই কম। আর প্রবীণরাই তাঁদের ইটালিয়ান সেলুন বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই সব প্রবীণ দাদু-কাকুর অবর্তমানে ইটালিয়ান সেলুন হয়তো শুধুই আমাদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে।

জয়ন্ত আচার্য, ব্লকপাড়া, গঙ্গারামপুর।